উপকূলীয় জলাভূমি সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু

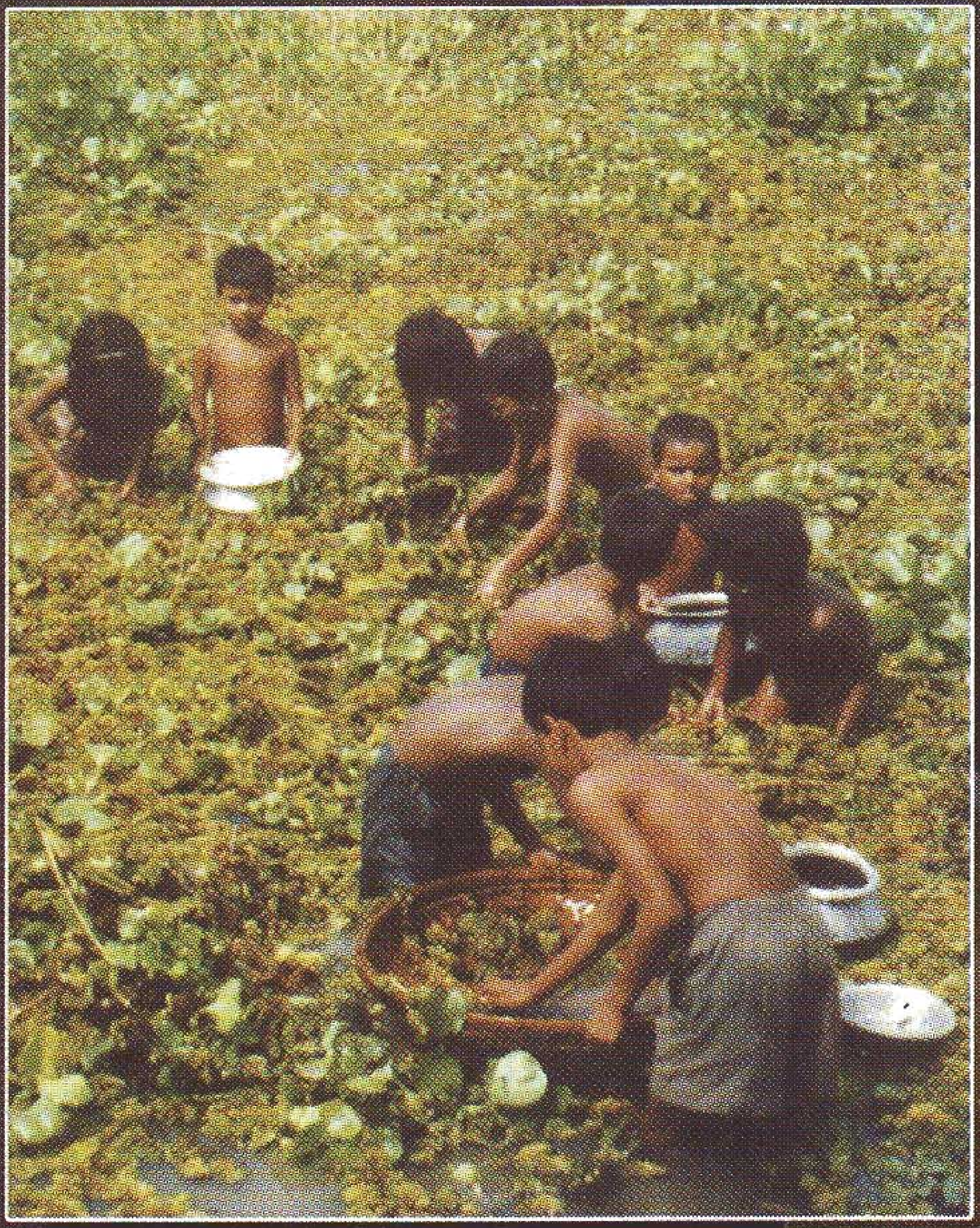

উত্তরণ

উপকূলীয় জলাভূমি সংরক্ষণ
একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু

প্রাক্‌কথন

বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। নদীর সাথে এদেশের মানুষের নাড়ির টান। উপকূলীয় অঞ্চলের নদীগুলির প্রকৃতি একটু ভিন্নতর। জোঁয়ার ভাটার এইসব নদীগুলো যুক্ত হয়েছে অসংখ্য জলাভূমির সাথে। উপকূলীয় জলাভূমি প্রাণবৈচিত্রে ভরপুর। সামুদ্রিক মাৎস্য প্রজাতি, স্থানীয় ও অভিবাসনীয় পাখীরা এই জলাভূমিকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ভ্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা এই সব অসংখ্য প্রাণের মৃত্যর কিম্বা স্থানান্তরিত হবার কারণ হয়েছে। তথাকথিত উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধু জলাভূমির প্রাণবৈচিত্র ধ্বংস করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, মানুষের জীবনেও টেনে এনেছে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের বোঝা। ক্ষরস্রোতা অনেক নদী শুকিয়ে এখন উঁচু ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা।

এই অঞ্চলের সমাজ উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে উত্তরণ জলাভূমির সংরক্ষণে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু গণ্য করে। এলক্ষ্যে উত্তরণের প্রচেষ্টা নিরন্তর। সমাজের প্রতিজন নাগরিক, রাজনীতিককে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট করতে উত্তরণ তার প্রচেষ্টা অব্যবহত রাখবে। এরই অংশ হিসেবে উত্তরণ এই এলাকার ১৮টি উপজিলায় রাজনীতিক এবং সুধীসমাজের সাথে এ বিষয়ে ধারণা বিনিময়ের লক্ষ্যে সংলাপ করতে চায়। সংলাপের প্রাথমিক তথ্য হিসেবে এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সূচনা হিসেবে এই পুস্তিকাটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে সবাইকে সাহায্য করবে-এটা আমাদের আকাঙ্খা। আমরা আশা করি সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের ভবিষ্যত কর্মকান্ডকে আরো জোরদার করবে।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

উপকূলীয় জলাভূমি সংরক্ষণ: একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু

-অশোক অধিকারী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে জলাভূমি। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের জলাভুমির চেয়ে এই জলাভূমি অঞ্চল সর্বোচ্চ জৈবিক উৎপাদনশীল এলাকা হিসেবে খ্যাত। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প এই ভঙ্গুর (fragile) প্রতিবেশিক জলাভূমির বৈশিষ্ট পরিবর্তন করে ধ্বংস করেছে এর প্রাণবৈচিত্র, সেই সাথে মানুষের জীবনে টেনে এনেছে এক অবর্ণনীয় কষ্টের বোঝা। ষাটের দশকে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে এই অনন্য বৈশিষ্ট সম্পন্ন জলাভূমিকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করার ভ্রান্ত পরিকল্পনা এই মহাবিপর্যয়ের সূত্রপাত করে। এরপর পর্যায়ক্রমে জলাবদ্ধতা, মানুষের সংগ্রাম এবং তাদের আত্মত্যাগ সবকিছু মিলিয়ে এই জলাভূমি অঞ্চল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে।

উত্তরণ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলার নিম্নাঞ্চলে সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ১৯৮৬ সাল থেকে এই সংস্থা দরিদ্র নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় উত্তরণ নানামূখী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। যদিও সকল অভিজ্ঞতাই সুখকর ছিলনা, তথাপি এই এলাকায় দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে উত্তরণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, উপকূলীয় জলাভূমির সংরক্ষণ ছাড়া এই এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অতি সংগত কারণেই এই আলোচনা উত্তরণের কর্মএলাকা এবং সংলগ্ন জলাভুমিকে ঘিরে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। জলাভূমি অসংখ্য প্রাণীকুলের চারণ ও প্রজননক্ষেত্র। অনেক প্রাণীর জন্যে জলাভূমি হচ্ছে নিরাপদ বাসস্থান। জলাভূমিতে অবস্থিত অসংখ্য প্রজাতির তৃণলতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদি স্থানীয় ও অভিবাসনীয় (migratory) পক্ষীকুলের আবাসস্থল। জলাভূমির তলদেশের সবুজ উদ্ভিদাদি এবং বৃক্ষাদির সবুজ পাতা এবং অন্যান্য অংশাদির পচনক্রিয়ায় উৎপন্ন বায়োমাস মাৎস্য প্রজাতির আশ্রয় ও খাদ্য সংস্থান নিশ্চত.করে থাকে। বাংলাদেশে জলাভূমির মোট আয়তন ৬,৯৬১,৫১১ হেক্টর যা মূল ভুমির প্রায় ৭০ শতাংশ।

রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি হচ্ছেঃ স্যাতসেতে, পিটভূমি কিম্বা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট জলাশয় এলাকা যা স্রোতস্বীনি অথবা স্রোতহীন, স্বাদু, লবণাক্ত বা মৃদু লবণাক্ত পানির পানি দ্বারা পূর্ণ। সামুদ্রিক এলাকার সেই অংশকে জলাভূমি বলা হবে যেখানে ভাটার সময় পানির উচ্চতা ৬ মিটারের নীচে থাকে। (“areas of marsh, fen, peatland or water whether natural or artificial, permanent or temporary with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including area of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters”) । অন্যকথায় জলাভূমি হচ্ছেঃ পরিবর্তনশীল জলজ প্রতিবেশ যেখানে পানির স্তর ভূমির উপরিভাগে অবস্থান করে অথবা সেই ভূখন্ড অগভীর পানি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে (“transitional terrestrial or aquatic system where the water table is usually at or near the surface of the land or the land is covered by shallow water”).

জলাভূমির মূল্যবোধ অপরিসীম। নিম্নে কয়েকটি প্রধান মূল্যবোধ বর্ণিত হলোঃ

১. উপরিভাগের পানি সরবরাহ;

২. মাটির স্তরে পানি সরবরাহ;

৩. বন্যা নিয়ন্ত্রন;

৪. পানি বিশুদ্ধকরণ;

৫. প্রাণ বৈচিত্র সংরক্ষণ;

৬. মৎস্য বৃদ্ধি;

৭. শুষ্ক মৌসুমে মৎস্য প্রজাতির চারণক্ষেত্র;

৮. স্থানীয় জলবায়ুর স্তিতিবস্থা সংরক্ষন;

৯. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ;

১০. কৃষি ব্যবস্থায় সহযোগিতা; এবং

১১. জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশে জলাভূমি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের জলাভূমিতে প্রায় ১১০ মিলিয়ন প্রাণের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই পরিমান পৃথিবীর সর্বোচ্চ। মৎস্য সম্পদ আহোরণ জলাভূমির প্রধান ব্যবহার হিসেবে গণ্য করা হয়। পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি পণ্যও উৎপাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আহোরিত মৎস্য সম্পদের প্রায় ৯৪ শতাংশ উন্মুক্ত জলাভূমি থেকে আসে। বাকী ৬ শতাংশ পুকুর কিম্বা মৎস্য চাষ থেকে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের জলাভূমিতে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া অসংখ্য মাৎস্য প্রজাতি জলাভূমিতে বিচরণ করে থাকে। পুষ্টি সরবরাহে জলাভূমি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর জলাভূমি রয়েছে। এই জলাভূমি মিষ্টি পানির জলাভূমি থেকে ভিন্নতর। উপকূলীয় জলাভূমি মূলতঃ সামুদ্রিক প্রজাতির মাৎস্য প্রজাতির বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র। কিন্তু উপর থেকে মিষ্টি পানির প্রবাহ লবনাক্ত ও মিষ্টি পানির মাঝামাঝি মৃদু লবনাক্ত এলাকায় অসংখ্য প্রাণের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। খাঁড়িমুখে প্রাণবৈচিত্র সর্বোচ্চ। পূর্বাহ্নেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জলাভূমি এলাকায় জলজ প্রাণীর পাশাপাশি অসংখ্য পক্ষী জাতীয় প্রাণের সমাবেশ হয়ে থাকে। কারণ জলাভূমি এলাকায় তারা সহজেই খাদ্য ও আশ্রয়ের সংস্থান করতে পারে।

মানুষের জীবনধারা এবং দূর্দশার শুরু:

যতদূর জানা যায় প্রায় তিনশ’ বছর আগে এই এলাকায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বসতি স্থাপনা শুরু হয়। ইতোপূর্বের জনবসতি মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে প্রায় বিলিন হয়ে গেলে মোগলদের হস্তক্ষেপে পুনরায় এই এলাকায় জনবসতি শুরু হয়। কোম্পানী শাসনামলে তাদের পৃষ্টপোষকতায় এই অঞ্চলে জনগোষ্ঠী আবার ফিরে এসে বসবাস শুরু করে। জীবিকা নির্বাহের জন্যে এই এলাকার জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব কায়দায় ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কৌশল রপ্ত করেছিল। এলাকার বিভিন্ন প্রকার

প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ততার উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলে বিভিন্ন পেশাজীবি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রতিটি পেশাজীবি গোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রাখে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী জলাভূমির প্রাণবৈচিত্র সংরক্ষণে একধরনের সাংস্কৃতিক ধারা সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ স্বাক্ষ্য দেয় যে, এই এলাকার মানুষের সম্পদের প্রাচুর্য হয়ত ছিলনা কিন্তু জীবন যাপনে তাদের সচ্ছলতার কমতি ছিলনা।

উপকূলীয় জলাভুমি এলাকায় অসংখ্য জোঁয়ার ভাটার নদী জালিকার মত বিস্তৃত হয়ে সমগ্র জলাভূমি এলাকায় সমুদ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিল। জোঁয়ারের পানিতে উঠে আসা পলি জলাভূমি এলাকায় পতিত হয়ে তা দেবে যাওয়া ভুমির (soil subsidence) উচ্চতার সামঞ্জস্য রক্ষায় অবদান রাখত। এভাবেই জলাভূমির ভূমি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। বৃটিশ শাসনামলে জমিদার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী বছরের আট মাস অস্থায়ী বাঁধ (অষ্টমাসী বাঁধ) দিয়ে জোঁয়ারের পানি থেকে তাদের ফসল রক্ষা করত। বাকী সময় জলাভূমি উন্মুক্ত থাকত। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি প্রথমে জলাভূমিতে পতিত হ'তো এবং তা নদীগুলো দিয়ে সমুদ্রে নিষ্কাশিত হ'তো।

ষাটের দশকে এই এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে (?) সমগ্র উপকুল এলাকা জুড়ে উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় জলাভুমিকে স্থায়ী বাঁধ দিয়ে নদীসমূহ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। এই বাঁধের মধ্যে আবার বাঁধ দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোল্ডার তৈরী করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল সারা বছরব্যাপী জলাভূমি এলাকায় উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের চাষ করা। অসংখ্য বাঁধ দেবার ফলে যেসব সামুদ্রিক প্রজাতি জলাভূমিতে বিচরণ ও প্রজননের উদ্দেশ্যে আসত তাদের চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে ফসলী জমি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহারকারীগণ জলাভুমির বৃক্ষাদি নির্বিচারে ধ্বংস করে ফেলে। খেচর জাতীয় প্রাণীরা তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দুটোই হারায়। খুব সংগত কারণেই তারা জলাভূমি এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আবার লোনা পানির প্রবাহ কমে যাবার/বন্ধ হয়ে যাবার ফলে অনেক প্রজাতি এই এলাকা থেকে হারিয়ে যায়। এভাবেই খুব দ্রুত অসংখ্য প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা জলাভূমি অঞ্চল প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

সময়ের পরিক্রমায় এই এলাকায় আবার নতুন কিছু বৃক্ষ প্রজাতির আগমন ঘটে , নতুন কিছু জলজ প্রাণের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপকূলীয় বাঁধ কালক্রমে কাল হয় দেখা দেয় জলাভূমির পরিবেশের জন্যে। জোয়ারের পানির সাথে উঠে আসা পলি জমতে থাকে নদীগর্ভে । অন্যদিকে পোল্ডারের অভ্যন্তরে পিটমাটি ক্রমশঃ দেবে গিয়ে নীচু হতে থাকে। এভাবেই সময়ের ব্যবধানে জলাভূমির তলদেশ থেকে নদীগর্ভ উঁচু হতে থাকে এবং এক সময়ে অবস্থার এমন অবনতি হয় যে, বর্ষামৌসুমের অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। পরিনতিতে খুলনা যশোর এবং সাতক্ষীরা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা আবারো পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। আশির দশকে শুরু হয়ে এই জলাবদ্ধতা নব্বই দশকের প্রায় শেষ অবধি এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত করে তোলে। জলাবদ্ধতা বিরূপ প্রভাবে সমাজে নানরূপ বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বসবাসের বাড়ীঘর ধ্বংস হয়েছে, গাছপালা মরে গেছে, পশুসম্পদের লক্ষণীয় অবনতি ঘটেছে, পরিবার ভেঙে গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকূলীয় জলাভুমি সংরক্ষণে উত্তরণের ভূমিকা:

জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারী সংস্থাসমূহ একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সকল প্রকল্পই উপকূলীয় বাঁধের অনুকরণে প্রনয়ন করা হয়েছে কিম্বা পরবর্তী প্রকল্পগুলো মূল প্রকল্পের সম্পুরক বা সম্প্রসারিত প্রকল্প হিসেবে প্রনীত হয়েছে। যেহেতু জলাভুমি এলাকার মানুষ জীবন দিয়ে অনুভব করেছে যে, উপকুলীয় বাঁধই তাদের সকল দূদর্শার কারণ, তাই তারা অনুরূপ প্রকল্পগুলোর বিরোধিতা করতে থাকে। অনেক এলাকায় নিষ্কাশনের উপায় নিরসনে সতোঃস্ফুর্ত গণকমিটি গড়ে ওঠে। এই সব গণ কমিটি কোথাও কোথাও বাঁধ কেটে দিয়ে পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়। উল্লেখ্য, জলাবদ্ধতার সুযোগে বহিরাগত ধনীক সম্প্রদায় নামমাত্র হারির বিনিময়ে প্রান্তিক চাষীদের জমি দখল করে এবং চিংড়ি চাষ শুরু করে। চিংড়ি গুটিকয়েক মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করলেও অধিকাংশ মানুষের দূর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে জলাভূমি অঞ্চলে নানারূপ সন্ত্রাসের সূচনা হয়েছে এবং এখনও তা বিরাজ করছে। অসহায় জনগোষ্ঠী এসময়ে যুগপত

এইসব কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। গণ মানুষের এই সংগ্রামে গোবিন্দ, করুণাময়ী সর্দারসহ আরো অনেক নাম না জানা মানুষ আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু মানুষের সংগ্রাম চলে নিরন্তর, ভিন্ন অবয়বে।

উত্তরণ মানুষের এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় ১৯৮৮ সালে। জলাবদ্ধতা নিরসনে মানুষকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি উত্তরণ জলাবদ্ধতার কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। দেশের পানি, মাটি, জলাভুমি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উত্তরণ ১৯৯৩ সালে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় আলোচক ও প্রবন্ধ উপস্থাপকদের লেখায় উন্মোচিত হতে থাকে জলাবদ্ধতার মূল কারণ। উত্তরণ জনগণের অতীত জীবনযাত্রা প্রণালী, ভুমি ব্যবহারের ইতিহাস ও পদ্ধতি পর্যালোচনা করে এবং আলোচক ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের সাথে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। এবিষয়ে কাজ শুরু করে উত্তরণ বুঝতে পারে যে, উপকূলীয় জলাভূমি সংরক্ষণ ছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জলাভূমি অঞ্চলে জৈবিক উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া জলাভুমির প্রাণবৈচিত্র রক্ষা করাও সম্ভব হবে না।

সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করে উত্তরণ এলাকার তৃণমূল জনগোষ্ঠী এবং বৃহত্তর সুধী সমাজকে বিষটির সাথে একাত্ম করার প্রচেষ্টা চালায়। দীর্ঘদিন পানি নিষ্কাশনের সাথে জড়িত ছিলেন এমন ব্যক্তিদের নিয়ে কাজটি শুরু হলেও ক্রমশঃ তা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে বিস্তৃত হতে থাকে। ঠিক এই সময়ে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ পনি উন্নয়ন বোর্ড মৎস্য সম্পদ ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। জলাবদ্ধতা নিরসন এবং কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলেও প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনায় দেখা যায় এই প্রকল্পটিও আগের প্রকল্পগুলির অনুরূপ। উত্তরণ নীতিগতভাবে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে এবং প্রকল্প পুনঃপ্রনয়নের আবেদন জানায়। পাশাপাশি এই প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশিক প্রভাব যাচাইয়ের দাবী উত্থাপন করে। উত্তরণ এই কাজে সুধীসমাজকে অন্তভূক্ত করতে সক্ষম হয়। জাতীয় পর্যায়ে এনজিওদের কোর্ডিনেশন কাউন্সিল এডাব এই এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়। জনগনের দাবীর মুখে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের একটি অংশে অর্থাৎ যশোর জেলায় টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট (টিআরএম) বাস্তবায়ন করতে সম্মত হয়। প্রকল্পের খুলনা অংশে প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা

হয়। বাস্তবায়নকালে ঐ এলাকার একটি বৃহৎ নদী হামকুড়াকে মেরে ফেলা হয়েছে। টিআরএমের মূল ভিত্তি হলো নদীর জোয়ারভাঁটা বজায় রেখে জলাভুমির অভ্যন্তরে পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে জলাভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করা এবং ভুমি গঠনে সহযোগিতা করা। আশা করা হয়েছে এই প্রক্রিয়ায় নদীগুলোর নাব্যতা বজায় থাকবে এবং ভরামৌসুমে নদীগুলো সফলভাবে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে ভুমিকা রাখবে।

পাশাপাশি জলাভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উত্তরণ দু'টি এ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা করেছে। একটি রিসার্চে জলাভুমি এলাকায় এবং নদীর ধারে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বৃক্ষরোপন। পাঁচ থেকে ছয়টি প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করলেও শেষপর্যন্ত চারটি প্রজাতির বৃক্ষ টিকে আছে। দেখা গেছে এই বাগানের অনেক বৃক্ষে এখন ফুল এবং ফল ধরেছে এবং এইসব বাগানে এখন অনেক পাখী আসছে।

অন্য রিসার্চটি ছিল জলাভুমিতে মেলে চাষ। মেলে একজাতীয় ঘাস প্রজাতির উদ্ভিদ যা জলাভুমিতে প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে। এই অঞ্চলের কিছু মানুষ মেলে দিয়ে মাদুর তৈরী করে। এটাই তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায়। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পর মেলের জন্মহার কমে যেতে থাকে। ফলে ঐ পেশাজীবি সম্প্রদায়টি তাদের জীবিকা হারাতে বসে। উত্তরণ জলাভূমিতে মেলে চাষ করে এবং নদীর সাথে জলাভূমির সংযোগ অব্যহত রাখে। দেখা গেছে বছর শেষে জলাভূমিতে কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ প্রজাতির মৎস্য প্রজাতি এই জলাভূমিতে বিচরণ করেছে। উত্তরণ পরপর তিনবছর মেলে চাষ করে উৎপাদন ও বিক্রয় মূল্য হিসাব করে দেখেছে যে, মেলের উৎপাদন চিংড়ী চাষের থেকে লাভজনক, পরিবেশসাশ্রয়ী এবং প্রাণবৈচিত্র সংরক্ষণে সহায়ক। উল্লেখ্য মেলে চাষে উত্তরণ কোন রাসায়নিক সার কিম্বা কীটনাশক ব্যবহার করেনি। আশেপাশের অনেক কৃষক মেলেচাষে এখন আগ্রহ বোধ করছে।

উপসংহার:

উপকূলীয় জলাভূমি সংরক্ষণে উত্তরণ তার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জলাভূমিতে জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণে উত্তরণের পরিকল্পনা আছে। ভবিষতে এই সংস্থা লবনসহশীল দেশী প্রজাতির ধানের সাথে জৈবিক উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক গবেষনা ও

কর্মসূচী পরিচালনা করতে আগ্রহী। সেই সাথে জলাভূমি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি করে জলাভূমির যৌক্তিক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার কাজও উত্তরণ অব্যাহত রাখবে। কারণ এই অঞ্চলের জন্যে জলাভূমি সংরক্ষণ খুবই জরুরী। জলাভূমিকে শুষ্কভূমিতে পরিণত করার অপচেষ্টা শুধু প্রাণবৈচিত্রই ধ্বংস করবে না, তা এই উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্যে স্থায়ী দুঃখের কারণ হয়ে দাড়াবে।

তথ্যসূত্র :

1. Freshwater Wetlands in Bangladesh: Issues and Approaches for Management, 1993, IUCN;
2. Wetlands of Bangladesh, 1994, Bangladesh Centre for Advance Studies;
3. Uttaran Reports;
4. Report of NC-IUCN.

উপকূলীয় জলাভূমি সংরক্ষণে গণ আন্দোলন একটি সফল কাহিনী

ভূমিকা ঃ

আশির দশকে থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জলাবদ্ধ কবলিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জনগণ বুঝতে পারে যে, ষাটের দশকে নির্মিত উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই জলাবদ্ধতার মূল কারণ। জলাবদ্ধতার স্থায়ী ও পরিবেশ সম্মত সমাধানের লক্ষ্যে এলাকায় একাধিক সতোঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হতে থাকে। কর্তৃপক্ষের (পানি উন্নয়ন বোর্ড) বিরুদ্ধে তানা নানাভাবে তাদের ক্ষোব ব্যক্ত করতে থাকে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং মৎস্য ও কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে গ্রহণ করে। এই প্রকল্পটি মূলতঃ উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের অনুরূপ বিধায় এলাকার জনসাধারণ সম্মিলিভবে তার বিরোধীতা করতে াকে। এ সময়ে তারা জলাবদ্ধতা দূরীকরণে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। স্থানয়ি এনজিওসমূহ এডাবের সহযোগিতায় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দাতাসংস্থার কাছে জনগণের বিকল্প প্রস্তাবনা তুলে ধরে। সামাজিক ও পরিবেশ যাচাইকরণ সমীক্ষায় নিয়োজিত সরকারের একটি সংস্থা জনগণের এই প্রস্তাবনাকে পরিবেশসম্মত, অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী, প্রযুক্তিগতভাবে সহজ এবং জনগণের কাছে উচ্চমাত্রায় গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করে। অবশেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের একটি অংশের জন্যে জনগণ প্রস্তাবিত প্রযুক্তিটি গ্রহণ করে। জনগণের এই সাফল্য জলাভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনে একটি মাইলফলক।

প্রেক্ষাপট :

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জলাভূমি পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যে অধিকারী। প্রতিদিন দুই বার এই জলাভূমিতে জোয়ার বাহিত পলি অবক্ষেপনে ভূমির উর্বরতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। সেই সাথে অসংখ্য সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি উপকূলীয় জলাভুমিতে চারণ ও প্রজননের উদ্দেশ্যে বিচরণ করে

থাকে। সবকিছু মিলিয়ে এই এলাকা মাছ ও ধানের উৎপাদন প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। ফলে এই এলাকায় খাদ্যের এবং কর্মসংস্থানের কোন ঘাটতি ছিলনা। এছাড়া উপকূলীয় জলাভূমি সংলগ্ন পৃথীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন এই অঞ্চলকে এক অনন্য বৈশিষ্ট মন্ডিত করেছে।

ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সারা বছর ধরে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্য জলাভুমিকে শুষ্কভূমিতে পরিণত করার লক্ষ্যে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীর আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় এই প্রকল্প ১৯৭৩ সালে সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্প প্রণয়নে এই এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশকে গণ্য করা হয়নি। প্রায় ১,৫৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় বাঁধের মাধ্যমে ৩৭টি পোল্ডার ও ২৮২টি স্লুইচ গেট নির্মাণ করা হয়। প্রকল্প শেষ হবার কয়েক বছর ধরে ফসল ফলানো সম্ভব হলেও এক দশক পর থেকে এই এলাকায় নানরূপ পরিবেশ বিপর্যায় দেখা দিতে শুরু করে। জনগণ লক্ষ্য করে যে, এলাকার জৈবিক উৎপাদন বিশেষ করে মাছের উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

আশির দশকের শুরুতে যশোরের নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হতে থাকে এবং জলাবদ্ধতা ক্রমশঃ নিচের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। একসময়ে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল (১০০,৬০০ হেক্টর জমি) জলাবদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়, খাদ্যের অভাবে গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যায় এবং জালানী ও পানীয় জলের ব্যাপক সংকট দেখা দেয়। সেই সাথে পানিবাহিত রোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কাজের সঙ্কট দেখা দেবার ফলে অনেক মানুষ শহরে চলে যায়। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সংগঠনগুলো সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। সংবাদ মাধ্যম এই সমস্যা ফলাও করে প্রচার করে। এসময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) খুলনা উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয় কিন্তু জনসাধারণের বাধার মুখে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে পাউবো খুলনা যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (কেজিডিআরপি) নামে প্রকল্পটি হাতে নেয়। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এই প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে।

কেজেডিআরপি যশোর, খুলনা জেলার ৮টি উপজেলার ১০০,৬০০ হেক্টর জলাবদ্ধ এলাকার পানি নিষ্কাশন ও মৎস্য এবং কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। এই প্রকল্পে কিছু রেগুলেটর এবং ক্রস ড্যাম তৈরীর প্রস্তাব করা হয়। এই প্রকল্পে অনেক ছোট ছোট পোল্ডারকে একটি পোল্ডারে আনার চেষ্টা করা হয়। এই প্রকল্পে সামাজিক সমাবেশীকরণের জন্যে এনজিওদের অন্তর্ভূক্তিকরণের কথাও বরা হয়। এই সুযোগে কিছু কথিত এনজিও কেজেডিআরপির পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে। কিন্তু যখন এই

প্রকল্পের প্রযুক্তিগত কর্মকান্ড উন্মোচন করা হলো তখন জনসাধারণ খুব সহজেই বুঝতে পারলো যে, কেজেডিআরপি উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের অনুরুপ। এ হচ্ছে নতুন বোতলে পুরনো মদ। ফলে জনগণের মধ্যে এই প্রকল্পের বিপক্ষে ব্যাপক মতামত গড়ে ওঠে। উত্তরণ জনগণের এই মতামতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং সমমনা এনজিওদের সাথে নিয়ে এডাবের ব্যানারে এই প্রকল্পের প্রযুক্তিগত কর্মকান্ড পরিবর্তনের জন্যে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে কয়েকজন এনজিও নেতৃবৃন্দ এডাব চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এই দলটি জনগণের বিকল্প প্রস্তাবনার একটি খসড়া মাননীয় মন্ত্রীর কাছে পেশ করেন। এর প্রেক্ষিতে পাউবো খুলনায় স্থানীয় এনজিওদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহবান করে। কিন্তু কোনরকম ঐকমত্য ছাড়াই এই সভা শেষ হয়। পাউবো তাদের নিজস্ব মতধারায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়।

এমতাবস্থায় কোন উপায়ন্তর না দেখে এডাব এবং সিইএন (কোয়ালিশন অব এনভায়রণমেন্টাল এনজিওজ) এডিবির কাছে একটি পত্রে কেজেডিআরপি বাস্তবায়নের পূর্বে সামাজিক ও পরিবেশিক প্রভাব যাচাইয়ের আবেদন জানান। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে এডিবির একটি দল প্রকল্প এলাকা ভ্রমণ করেন এবং পাউবোর উপস্থিতিতে এডাবের সাথে একটি সভায় মিলিত হন। এই সভায় পাউবো সামাজিক ও পরিবেশিক প্রভাব যাচাইয়ে সম্মত হয়। সিদ্ধান্ত হয় একটি স্বাধীন দল এই যাচাইয়ের জন্যে নিয়োগ করা হবে কিন্তু পাউবো কোনরকম আলোচনা ছাড়াই তাদের নিজেদের একটি সংস্থা দিয়ে যাচাইয়ের কাজ শুরু করে। জনসাধারণ পাউবোর এই আচরণের বিরোধিতা করে।

পাউবোর নিয়োজিত দল (ইজিআইএস) যখন সামাজিক ও পরিবেশিক প্রভাব যাচাইয়ের জন্যে প্রকল্প এলাকায় আসে তখন জনসাধারণ এই প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সমাধান প্রত্যাখান করে এবং তারা জোয়ারাধার নির্মাণের মাধ্যমে নদীতে জোয়ার-ভাটা প্রবাহিত করার (টিআরএম) পক্ষে জোর দাবী জানায়। অন্যদিকে কথিত কিছু এনজিও যারা এই প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী তারা প্রকৌশলগত প্রযুক্তির পক্ষে মতামত গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ সমগ্র জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় অন্যান্য এনজিওরা তখন প্রকৌশলগত প্রযুক্তির বিপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। জনগণের প্রবল চাপের মুখে ইজিআইএস টিআরএমকে ৬ষ্ঠতম প্রযুক্তি হিসেবে তাদের রিপোর্টে সংযুক্ত করে। ১৯৯৮ সালে তারা এই রিপোর্ট জমা দেয়।

তারা এই প্রযুক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী, সামাজিকভাবে উচ্চ মাত্রায় গ্রহণযোগ্য, পরিবেশসম্মত এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য প্রযুক্তি বলে আখ্যায়িত করে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সারের ডিসেম্বর মাসে এডিবি তাদের এইড মেমোরেন্ডাম সংস্কার করে।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর এলাকার জনগণ এবং উত্তরণসহ অন্যান্য এনজিওরা টিআরএম বাস্তবায়নের জন্যে জোর দাবী জানাতে থাকে। এই পর্যায়ে একটি প্রভাবশালী মহল যারা সবসময়ই প্রকৌশলগত প্রযুক্তিকে সমর্থন করে এসেছে তারা এনজিওদের উপর বিশেষ করে উত্তরণের উপর খুবই নাখোশ হয় এবং উত্তরণ ও পানি কমিটির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে নানারকম প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে থাকে। এছাড়াও পাউবো আন্দোলনের সাথে জড়িত ১০২ জনের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদের অযথা হয়রানি করে। উত্তরণ এসব মানুষকে আইনী সহায়তা প্রদান করে।

সুধী সমাজের ভূমিকা :

জলাভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনে সামাজিক সমাবেশীকরণে উত্তরণের নেতৃত্বে এনজিওরা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ (সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসক সমাজকর্মী) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণদাবী বাস্তবাযনে ধারণাপত্র প্রস্তুতকরণে, তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে এবং সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাপক প্রচারণায় এনজিওরা জোরদার ভূমিকা রাখে। এ বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমমনা সংগঠনসমুহের সাথে জোট বাধতেও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

তৃণমূল সমাবেশীকরণ :

এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এনজিওদের সমন্বয়ে সংযোগ নামে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। সংযোগের উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিয়ে মত বিনিময সভা, কর্মশালা এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিষয়টির সহজবোধ্য যোগাযোগ সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি ফ্লিপচার্ট তৈরী করা হয়। একই সাথে টিআরএম এর বিষযেও জনগণকে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি গণসাংস্কৃতিক কেন্দ্র নামে একটি সংগঠন পরিবেশ ও জলাবদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নাটক মঞ্চস্থ ও প্রদর্শন করে। জলাবদ্ধতার শিকার জনগোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে সতোঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। এর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কমিটি হচ্ছে বিল ডাকাতিয়া সংগ্রাম কমিটি। অন্যদিকে উত্তরণের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা পানি কমিটি তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মাঝে তথ্য সরবরাহ, তাদের নিয়ে সভা, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন অব্যাহত রাখে।

সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণা :

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে উপকূলীয় জলাভূমির টেকসই উন্নয়ন শিরোনামে উত্তরণ একটি বই প্রকাশ করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জলাবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট সংবাদ কাটিং করে তা সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়। অধিক এবং সার্বক্ষণিক জনসমাবেশ ঘটে এমন সব স্থানে জলাবদ্ধতা, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে দেয়াল লিখন করা হয়। সমাজের মতামত সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর জন্যে মাসিক উপকূল বার্তা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পার্শ্ববর্তী থানা এবং জেলা শহরের সাংবাদিকদের বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের লক্ষ্যে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। জলাবদ্ধতা, উপকূলীয় বাঁধ ও বর্তমান পরিবেশ বিপর্যের উপর একটি ভিত্তি ফিল্ম প্রস্তুত করা হয় এবং তা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যজোট গঠন :

আন্দোলন চলাকালীন সময়ে উত্তরণ এডাব এবং সিইএন এক সাথে জোট বাধে। এডাব গুরুত্বপুর্ণ সরকারী কর্মকর্তা এবং দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধির সাথে একাধিক সভার আয়োজন করতে সহযোগিতা করে। সিইএন বিষয়টির সামগ্রিক এ্যাডভোকেসিতে সহযোগিতা করে।

পার্সুয়েশন :

উত্তরণ এডাবের সাথে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদানের জন্যে নিম্নলিখিত সংস্থার কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারকদের সাথে একাধিক বৈঠক করে।

- পানি উন্নয়ন বোর্ড;
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;
- বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়;
- স্থানীয় সরকার;
- স্থানীয় রাজনীতিবিদ বিশেষ করে সংসদ সদস্যবৃন্দ;
- কেজেডিআরপির পরামর্শক দল;
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

উত্তরণ এডিবির সাথে একাধিক পত্র যোগাযোগ করে এবং তাদের ১৯৯৮ সালের ২৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত গভর্নিং বোডির যে মিটিং হয় সেখানে উত্তরণের প্রতিনিধি যোগ দেয়। এই মিটিং-এ উত্তরণ প্রতিনিধি জলাবদ্ধতা সমস্যা সম্পর্কে এডিবি বোর্ড মেম্বার এবং আগত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন।

উত্তরণ এবং এডাবের এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলাফল :

দীর্ঘদিনের এই কার্যক্রমের ফলে যে সব জনগণ এলাকার পরিবেশ বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত ছিল না তারা এলাকার অন্যান্য পরিবেশ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবেচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সকল মহলই এখন অনুধাবন করেছেন যে, ষাটের দশকে নির্মিত উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প এই এলাকার ভঙ্গুর প্রতিবেশকে ধ্বংস করেছে এবং এর জৈব উৎপাদনশীলতা সংকুচিত করেছে এবং সুন্দরবন মহা হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। স্থানীয় এনজিওরা উপকূলীয় জলাভূমিকে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচতে অন্তর্ভূক্ত করেছে। পরিবেশ ইস্যুকে কেন্দ্র করে এলাকার এনজিওরা একটি নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে। টিআরএম প্রযুক্তি প্রতিবেশ পুনঃসংস্থাপনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মোচন করেছে এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে টেকসই সমাধান নিশ্চিত করেছে।

উপসংহার :

জনগণ তাদের নিজেদের ভালো নিজেরা বোঝেনা- এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সবসময়ই বিরাজমান ছিল। কিন্তু এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করল যে, জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত সবসময় স্থানীয় সমস্যা নিরসনে কাজ করেনা। উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্প জনগণের জীবনে মারাত্মক দূর্গতি টেনে এনেছিল। জনগণের সতোঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এর একটা টেকসই সমাধান পাওয়া গেছে।

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে॥
-----মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কপোতাক্ষ: যে নদের মৃত্যু জনপদের ধ্বংস ডেকে আনবে

-শহিদুল ইসলাম

বিগত কয়েক বছর ধরে উপকূলীয় বাঁধ সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকার অধিবাসীদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং সেই সাথে গত বছরের প্রলয়ংকারী বন্যা মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মত আঘাত করে। তাছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সাধারণ মানুষ আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। সরকারের গৃহীত উদ্যোগ মনঃপুত না হবার প্রেক্ষিতে আন্দোলনকারী জনতা তার বিরোধিতা করে যা একসময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম প্রধান দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। রাষ্ট্র বনাম জনগণের এই দ্বন্দ্বের পরিধি ক্রমান্বয়ে আরো বিস্তৃত হচ্ছে। কারণ প্রধান প্রধান নদীগুলো পলি দ্বারা ভরাট হয়ে জলাবদ্ধ এলাকা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আশির দশকের মাঝামাঝি 'হামকুড়া' ও 'শৈলমারি' নদী পলি দ্বারা ভরাট হবার প্রেক্ষিতে বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলে জলাবদ্ধতার সূচনা হয়। নব্বই দশকের প্রথম দিকে 'বুড়িভদ্রা' নদী

ও ঐ একই দশকের মাঝামাঝি সময়'শ্রী' নদী পলি দ্বারা ভরাট হবার প্রেক্ষিতে কেশবপুর, মণিরামপুর ও তালা থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জলাবদ্ধতার শিকার হয়।

গত বছর থেকে কপোতাক্ষের দু'কূলবাসীরা বিশেষকরে, কেশবপুর, মনিরামপুর ও কলারোয়া থানার কিছু এলাকা প্রথম বারের মত জলাবদ্ধতার শিকার হয়। চলতি বছর বর্ষার শুরুতে ওই এলাকায় আবারো জলাবদ্ধতার শিকার হয়ে পড়েছে এবং তা ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে। কারণ সাগরদাঁড়ী থেকে ঝিকরগাছার বাকড়া পর্যন্ত কপোতাক্ষ নদটি সম্পূর্ণভাবে জোয়ার বাহিত পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে ভরাট হয়ে গেছে। এদিকে কপোতাক্ষই হলো এই এলাকার প্রধান নিষ্কাশন চ্যানেল। তাই এই ঘটনা সমগ্র এলাকাবাসীকে প্রচন্ড উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

কপোতাক্ষ নদের উৎপত্তি ভৈরব নদী থেকে যা যশোরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে সাতক্ষীরায় প্রবেশ করে 'আড়পাঙাসিয়া' নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। অন্যদিকে ভৈরব নদীটি তাহেরপুর থেকে লোয়ার ভৈরব নাম নিয়ে খুলনা হয়ে বলেশ্বর নদীর সাথে মিলিত হয়। উনবিংশ শতাব্দিতে ভৈরব নদীটি তাহেরপুর থেকে যশোর শহর পর্যন্ত পলিদ্বারা ভরাট হয়ে গেলে কপোতাক্ষ হয়ে ওঠে ভৈরবের প্রধান খাত। একদা কপোতাক্ষ দিয়ে পদ্মার বিপুল জলরাশি বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। বর্তমানে ভৈরব বা কপোতাক্ষের সঙ্গে পদ্মার প্রবাহের কোন সম্পর্ক নেই। এটি শুধুমাত্র বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর এবং সাতক্ষীরার একটি অংশের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের চ্যানেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এই নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদটির বর্তমান অবস্থা বিচার করলে একে তিনভাবে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথমতঃ মণিরামপুরের ঝাঁপা থেকে বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়ার অংশে কপোতাক্ষ একটি মৃতনদ হলেও নদের খাত বর্তমানে আছে। যা অনেকাংশ ড্রেনেজ চ্যানেলের উপযোগী। যদিও স্থানবিশেষ শেওলা ও অন্যান্য আগাছা পূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ মণিরামপুরে ঝাঁপা থেকে কেশবপুরের সাগরদাঁড়ি পর্যন্ত আরেকটি অংশ। এই অংশ জোয়ার বাহিত পলি অবক্ষেপিত হয়ে ইতোমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে এবং এই অংশের কোথাও কোথাও নিষ্কাশন চ্যানেলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতার।

তৃতীয় ঃ সাগরদাঁড়ীর নিচে বর্তমানে জোয়ারভাটা চালু থাকলেও দ্রুত জোয়ার বাহিত পলি নদীবক্ষে অবক্ষেপিত হয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নদের মৃতপ্রান্তসীমা

দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় মাঝিমাল্লাদের মতে কোথাও কোথাও ভরাট হওয়ায় পরিমাণ বছরে দুই থেকে চার ফুট পর্যন্ত। এই পলি অবক্ষেপণে কপোতাক্ষের ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

আসলে গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে এই পরিবেশ বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে। এটি ঘটেছে মূলতঃ দুটো কারণে- একটি হলো গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন হওয়া, অন্যটি হলো প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপ। ষোড়শ শতাব্দির পূর্ব পর্যন্ত গঙ্গার মূল প্রবাহ ছিল ভাগিরথী এবং তা আট ভাগে বিভক্ত হয়ে চব্বিশ পরগণা ও খুলনার ওপর দিয়ে সমুদ্রে পতিত হতো। মূলতঃ গঙ্গাবাহিত পলি দ্বারা যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ফরিদপুর, বরিশাল গঠিত হয়েছে এবং হয়েছে উর্বর। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দিতে গঙ্গার গতিপথ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণ দিক হতে পূর্বমূখী হতে থাকে এর ফলে গঙ্গা নির্ভর উপরোক্ত জেলাসমূহে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমতে থাকে। এর প্রেক্ষিতে খুলনা, চব্বিশ পরগণা ও যশোরের দক্ষিণ অংশে জোয়ারের চাপ বেড়ে যায়, ফলে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাছাড়া একই সময় এই অংশে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত বৃদ্ধি পায় যার জন্য এ অঞ্চল জনশুন্য বিরাণভূমিতে পরিণত হয়। এদিকে উনবিংশ শতাব্দিতে মধ্যবঙ্গে গঙ্গার অন্যতম শাখা নদী 'মাথাভাঙ্গার' স্রোতের তীব্রতা হ্রাস করার জন্য ব্রিটিশ সরকার এ নদীর উৎস মুখে বড় বড় মাটিভর্তি নৌকা ডুবিয়ে এর স্রোতের তীব্রতা হ্রাস করে। ফলে এর উৎসমুখ দ্রুত ভরাট হয়ে যায় এবং কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা এলাকায় মিষ্টি পানির প্রবাহ আরো হ্রাস পায়।

এদিকে ভৈরব নদী যশোর, খুলনা এবং কুষ্টিয়ার পশ্চিমাংশে মিষ্টি পানি সরবরাহের একমাত্র উৎস ছিল। মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে প্রবাহিত 'জলাঙ্গি' এবং কুষ্টিয়া জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙার দুটি শাখা নদী মিলিত হয়ে ভৈরব নদী তৈরী করে। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে মাথাভাঙার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং একই সঙ্গে জলাঙ্গীর যে শাখা মাথাভাঙ্গার শাখার সংগে মিলিত হয়ে ভৈরব নদী তৈরী করেছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে ভৈরব নদীর মিষ্টি পানির প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং এই নদীর মিষ্টি পানির উপর নির্ভরশীল এলাকা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৮৭২ সালে যশোর ও খুলনায় মারাত্মকভাবে ম্যালেরিয়া মহামারি আকারে বিস্তার লাভ করে এবং এ বিষয়ে ডাঃ জ্যাকসন ভৈরবের অপমৃত্যুকে দায়ী করেন।

পরিস্থিতির আরো অবনতি হয় 'গড়াই' এর প্রবাহ হ্রাস পেলে। যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও ফরিদপুরের একাংশ নির্ভরশীল ছিল গড়াই এর প্রবাহের উপর। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধ চালু হবার পর গঙ্গার প্রবাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় তা কখনও কখনও ১০(দশ) হাজার কিউসেকের নিচে নেমে আসে। যার ফলে গড়াইয়ের উৎসমুখ শুষ্ক মৌসুমে বন্ধ হয়ে যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণ চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধি পায়। লবনাক্ততা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে একদিকে যেমন সুন্দরবন হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে- দেখা দিয়েছে সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, অন্যদিকে তেমনি খুলনার শিল্প অঞ্চলসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। যদিও গঙ্গার পনি বন্টন চুক্তি এবং গড়াই পূনরুদ্ধার প্রকল্পের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে গড়াইয়ের প্রবাহ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে তবে তা সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়।

এদিকে যশোরের দক্ষিণ অংশ এবং সমগ্র বৃহত্তর খুলনার অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা না করে ষাটের দশকে অধিক খাদ্য ফলানোর নামে অসংখ্য বাঁধ নির্মাণ করা হয়। যার ফলে গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ হবার কারণে বিপর্যস্ত জনপদ আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মূলতঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মিষ্টি পানি প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই বিপর্যস্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯১৯ সালে প্রখ্যাত পানি বিজ্ঞানী উইলিয়াম কক্স গঙ্গার মাথাভাঙা নদীর উৎসের নীচে বাঁধ দিয়ে এর উপরের অংশের পানির উচ্চতা ৭ ফুট বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এর ফলে যে সকল নদীর উৎসমুখ ভরাট হয়ে গেছে, সেই সকল নদীগুলোকে পুনরায় সচল হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু আর্থিক কারণে এই প্রকল্প তখন গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বললেও কোন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয়ের সাথে কপোতাক্ষের একাংশ জোয়ার বাহিত পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে ভরাট হয়ে যাবার ফলে পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছে। বর্তমানে কপোতাক্ষ বৃহত্তর যশোর-কুষ্টিয়ার পশ্চিমাংশ ও সাতক্ষীরার একাংশের নিষ্কাশন চ্যানেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু নদটি ভরাট হবার ফলে অপেক্ষাকৃত উঁচু যশোর এবং কুষ্টিয়ার পানি নিম্নাংশে চাপ সৃষ্টি করছে। যার ফলে ঝিকরগাছা, মণিরামপুর, কেশবপুর ও কলারোয়ার একাংশ বর্ষা শুরুর সাথে সাথে প্লাবিত হয়ে জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছে। গত বছর প্রলয়ঙ্কারী বন্যার পূর্বেই এ এলাকা

জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলে এই চার থানার নদের পাশে বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

প্লাবিত কপোতাক্ষ নদের বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

এ বছর আগাম বর্ষণ শুরু হয়েছে। বর্ষা শুরু হওয়ার সামান্য আগে জয়নগর-মেহেরপুর এবং ক্ষেত্রপাড়া গোপাসনা এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২টি ক্রস ড্যাম নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল ক্রস ড্যামের উজানে নদী খনন। এর ফলে ক্রস ড্যামের ভাটিতে অতিদ্রুত পলি জমে নদীবক্ষ এতো উঁচু হয়েছে যে ক্রস ড্যাম অপসারিত হওয়ার পরও উজানের বর্ষার পানি আর নিষ্কাশিত হতে পারছেনা। তাছাড়া ক্রসড্যাম অপাসরণ করার সময় ঠিকমতো নদীর তলদেশের সাথে লেভেলিং করা হয়নি। এসব কারণে গত বছরের তুলনায় এবারকার বর্ষার প্লাবনের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে কপোতাক্ষ নদের বাকড়া থেকে উজান এলাকা উঁচু, সাগরদাঁড়ী থেকে নিম্নাংশ কপোতাক্ষ বক্ষ পলিজমে উচু হয়েছে, মাঝখানে সাগরদাড়ী থেকে প্রায় বাকড়া পর্যন্ত কপোতাকস বক্ষ নীচু ফলে উপরের সমস্ত বর্ষার পানির চাপ এসে মাঝখানের এই নিচু এলাকা প্লাবিত করছে। ইতিমধ্যে যে সব এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে তা হচ্ছে ঃ

জেলা	উপজেলা	ইউনিযন	গ্রাম
যশোর	ঝিকরগাছা	বাকড়া	দিকদানা, কুশলনগর
	মনিরামপুর	মশিস্মানগর ও ঝাপা	খাজুরা, পারখাজুরা, চাকা, নোয়ালী, ভরতপুর, হাজরাকাটি, কাঁঠালতলা, চাঁপাতলা, মর্শিয়া, দিকদানা।
	কেখবপুর	ত্রিমোহিনী	চাদড়া, মির্জানগর, বরণডালী, মীরের ডাঙ্গা, সরসকটি, শাহাপুর।
		সাগরদাঁড়ী	গোপসানা, মেহেরপুর, চিংড়া, গোবিন্দপুর, কোমলপুর, মির্জাপুর
আতক্ষীরা	কলারোয়া	জয়নগর	ক্ষেত্রপাড়া, খোর্দবাট্রা, রামকৃষ্ণপুর, মানিকনগর, জয়নগর, নীলকণ্ঠপুর॥
		জালালাবাগ	বৈদ্যনাথপুর, সিংহলাল, বাটরা, আহছান নগর
		খোর্দ	দেয়াড়া, কাশিয়াডাঙ্গা, খোর্দবাজার
		যুগীখালী	বামনালী, উজিরপুর, যুগীখালী, রাজনগর, গোছমারা, মানিকনগর।
২টি	**৪টি**	**৯টি**	**৪৩টি**

জলাবদ্ধ এলাকার জনপদ এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে অনেক পরিবার ঘরবাড়ী ছেড়েছে। খাবার পানি, পশুখাদ্যের তীব্র অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৃষ্টি মৌসুমে পুরোপুরি শুরু হলে বিপর্যয় ও দূর্ভোগের পরিমান আরো বেড়ে যাবে-এই আশংকায় এলাকাবাসী আতংকিত দিন যাপন করছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ মানুষের একান্ত কামনা এই সমস্যার দ্রুত সমাধান। কারণ জোয়ারবাহিত পলি অবক্ষেপিত হওয়ায় মাধ্যমে এ এলাকার সকল নদী ভারাট হবার প্রক্রিয়ায় আছে, তাই এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে এই এলাকা সম্পূর্ণভাবে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েবে। তাছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিবের সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আগমনকালীন বিশ্ব উষ্ণতা জনিত কারণে এদেশের দক্ষিণাংশের তলিয়ে যাবার আশংকা ব্যক্ত করেছেন। একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অন্যদিকে ভূমির নিম্নগমন হচ্ছে। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ সর্বপ্রথম এবং সর্বাদিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই এলাকা মূল ভূখন্ড বা তার সম্প্রসারিত অংশ নয়, বরং এ এলাকা হলো উপকূলীয় জলাভূমি বা জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমি এবং এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনন্য। তাই কপোতাক্ষ অববাহিকায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং নদীবক্ষে অবক্ষেপিত জোয়ার বাহিত পলির অপসারণ ও তার ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরী। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দু'ধরনের কৌশল নেওয়া যেতে পারে-

১। প্রকৌশলগত সমাধান ঃ

এই সমস্যার প্রকৌশলগত সমাধান হতে পারে নদী খনন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা দূর, নদী শাসন ইত্যাদি সকল সমস্যা দূর করার জন্য প্রকৌশলগত সমাধানে দক্ষ। অর্থাৎ তারা বাঁধ, স্লুইজগেট, খাল খনন, নদী খনন ইত্যাদি প্রকৌশলগত কার্যক্রমের উপর আস্থা স্থাপন করে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। তাই নদী খনন করে বা প্রয়োজনে কোথাও কোথাও স্লুইচগেট স্থাপন করে সাময়িকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তবে এই ধরণের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে ষাটের এর দশকে বাস্ত বায়িত উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের ক্ষতিকর দিক সমূহ অবশ্যই বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। এ অঞ্চলের লবাণাক্ত পানি প্রতিরোধের নামে বিশাল ব্যয় বহুল উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১৯৬২-৭৩) বাস্তবায়িত হয়। যার ফলে জোয়ার বাহিত পলি প্লাবন ভূমিতে অবক্ষেপিত হতে না পেরে নদী বক্ষে অবক্ষেপিত হয়ে

সকল নিষ্কাশন চ্যানেলগুলোকে ভরাট করে ফেলেছে এবং দেখা দিয়েছে মারাত্বক জলাবদ্ধতা। তাই সমস্যার প্রকৌশলগত সমাধানের ব্যাপারে ইতোমধ্যে এ অঞ্চলে এক ধরণের নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে।

২। প্রতিবেশিক প্রযুক্তিগত সমাধান ঃ

যেহেতু ইতিমধ্যে প্রকৌশলগত সমাধানের ব্যাপারে জনগণের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে, তাছাড়া এ কৌশল উপকূলীয় জলাভূমির সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ একথা প্রমাণিত হয়েছে(বিল ডাকাতিয়া যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ), সেহেতু, পরিবেশ ও প্রতিবেশের কথা বিবেচনা করে নতুন কৌশল গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে "খুলনা-যশোর ড্রেনেজ রিহাবিলিটেশন প্রজেক্ট" উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এই প্রকল্পের ব্যাপারে জনগণের আপত্তির মুখে সরকার ও দাতা সংস্থা EGIS কে দিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। এই নতুন কৌশলের তারা নাম দিয়েছে TRM (Tidal River Management)। এই বিকল্প প্রস্তবনা মূলতঃ জনগণেরই, যা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল।

মূলতঃ তাদের প্রস্তাবনা হলো, নদীতে জোয়ার ভাটা অব্যাহত রেখে জোয়ার বাহিত পলির বিকল্প অবক্ষেপণের ব্যবস্থা (কৃত্রিম টাইডাল বেসিন) করার মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করা এবং একই সঙ্গে জীব-বৈচিত্র্য বজায় রাখা। দাতা সংস্থা তাদের এইড মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করেছে TRM ব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক, পরিবেশ সাশ্রয়ী, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাস্তবায়নের যোগ্য এবং জনগণের কাছে উচ্চ গ্রহণযোগ্য। কপোতাক্ষের প্রধান সমস্যা হলো- জোয়ার বাহিত পলি, যা নদের মৃত প্রান্ত সীমায় অবক্ষেপিত হয়ে নদকে দ্রুত ভরাট করে ফেলছে। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য নদী খননের পাশাপাশি পলি অবক্ষেপণের জন্য কৃত্রিম জলাধার (টাইডাল বেসিন) তৈরী করতে হবে। যা জোয়ার বাহিত পলির বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি উদ্ধারে এবং নিষ্কাশন চ্যানেলকে দীর্ঘ সময় ধরে কার্যক্ষম রাখতে সহায়ক হবে। তাছাড়া প্রতিবেশিক ও পরিবেশগত ভাবে এই এলাকা খুবই ভঙ্গুর। তাই সমস্যার কোন প্রকৌশলগত সমাধান নতুন নতুন বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারে।

উপসংহারঃ

উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প যখন বাস্তবায়িত হয় তখন দক্ষিণ-পশ্চিম জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমি এলাকার অধিবাসীরা বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা ও জ্ঞানের উপর আস্থা স্থাপন করে এই প্রকল্পে বাস্তবায়নে সহায়তা করেছিল। কিন্তু তারা অচিরেই বুঝতে পারে তাদের এই আস্থা স্থাপন মারাত্মক ভুল হয়েছে। কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বিস্তৃর্ণ এলাকা জলাবদ্ধ হয়, ধ্বংস হয় জীব-বৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবন হয় বিপন্ন ও দূর্বিসহ। এই উপলব্ধিবোধ থেকে মানুষ-সৃষ্ট এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা আন্দোলন করেছে, সংগ্রাম করেছে এবং একই সাথে নিজেদের শত শত বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে চেয়েছে, তার বাস্তব উদাহরণ "খুলনা-যশোর ড্রেনেজ রিহাবিলিটেশন প্রজেক্ট" এর প্রস্তাবিত টেকনিক্যাল অপশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত ইজিআইএস সুপারিশকৃত জনগণের বিকল্প প্রস্তাবনা সরকার ও দাতা সংস্থা কর্তৃক গ্রহণ। তাই এ অঞ্চলের জনগণ পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকেই পরিবেশসম্মত সমাধান চায় এবং একই সাথে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে তাদের মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে। তাছাড়া একথা বলা একান্তই প্রয়োজন যে, জনগণের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ছাড়া প্রতিবেশিক দিক দিয়ে ভঙ্গুর এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের কৌশল খুঁজে পাওয়া খুবই দুরুহ। এদিকে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে কপোতাক্ষ নির্ভরশীল এলাকায় শত শত বছর ধরে গড়ে উঠা সভ্যতা ধ্বংস হবে এবং লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠবে আকাশ বাতাস ধরণী।